স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিনী জীবনে ও সাহিত্যে

শম্পা ভট্টাচার্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে (১৯৫০) 'কিশোর পাকা' পুলিশের বীভৎস অত্যাচার সহ্য করেও নীরব থাকে। বিপ্লবী বন্ধুরা তার মাসি সুধার পদস্খলনের কারণে তাকে বাতিল করে। উপন্যাসে একটি সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে প্রতিমা। বিপ্লবী দলে তার জায়গা নেই। তবু সে বিপ্লবী প্রেমিক অমিতাভর সাহচর্য খোঁজে। অ্যাকশনে মৃত অমিতাভকে দেখবে বলে গভীর রাতে পুরুষের পোশাক পরে পাড়ি দেয়। উপন্যাসে প্রতিমা চরিত্রটি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। সাহিত্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী মেয়েদের যুক্ত থাকার একটা অস্পষ্ট মানচিত্র হয়ত এখান থেকে অনুধাবন করা যাবে। মধ্যবিত্ত তরুণের উদ্যোগে উনিশ শতকে নারীমুক্তির বিষয়টি সমাজ সংস্কারের অন্তর্গত হল। হিন্দু সমাজে মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল হীন। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন থেকে মেয়েদের শিক্ষার দাবি, বিধবা বিবাহ বা এক্ষেত্রে বয়স বিতর্ক — শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই আত্মানুসন্ধানের একটা দিক ছিল নারীর উন্নয়ন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষে হয়ত এক নয়া পিতৃতন্ত্রের সৃজন হল যাতে মেয়েদের সম অধিকারের একটি প্রশ্ন নিয়ন্ত্রণে রাখা হল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাঙালি মেয়ের ভবিতব্য বাড়ির পুরুষের ঘোষিত বা অঘোষিত সিদ্ধান্তের উপর শুধু যে নির্ভরশীল ছিল তা নয়, মেয়েদের জীবনে এই জাতীয়তাবোধ কীভাবে কতটা কেমন উপায় প্রতিফলিত হতে পারে, স্বদেশসেবায় সে কতটা অংশীদার হতে পারে এবং তাতে দেশের মঙ্গলসাধন কীভাবে হতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুরুষ সমাজ। মেয়েদের যে এ বিষয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা বা সংস্কার থাকতে পারে সে প্রসঙ্গে খোঁজ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। সাহিত্যেও ঠিক তাই ঘটেছে। প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর 'আর্যবার্তা' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন — 'মনে রেখ, যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী জন্মেছিল সেটাই তোমার জন্মভূমি।' পরিবার বা গৃহ দেশের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ। উনিশ শতকের ধারণা অনুযায়ী পুরুষ বাইরের জগতের বাসিন্দা। সে ঔপনিবেশিকতার শিকার। নারী অন্দরমহলের বাসিন্দা। সে পবিত্রতা আর ঐতিহ্যের আধারস্বরূপ। সতীদাহ, বিধবাদের আত্মাহুতি এসবের মধ্য দিয়ে নারীদেহ হয়ে উঠল হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক। কংগ্রেসের নেতারা ক্রমশঃ বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেয়েদের অন্তর্গত করা প্রয়োজন। পরিবারের দিক থেকে সমর্থন থাকায় celebrity পরিবারের মেয়েরা তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন আইন পরিষদ এবং কমিটিতে অন্তর্গত হওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়েও তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এই অন্তর্ভুক্তির একটা মিশ্র

চেহারা ছিল। কোথাও পিতৃগৃহে মেয়েরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহী, কোথাও বা তার উল্টোটা। বাড়ির পুরুষটি ব্রিটিশ শাসকের কর্মচারী হলে অন্দরমহলের কণ্ঠ রুদ্ধ। ব্যতিক্রম ছিল না যে তা নয়। বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারের বিপ্লবী, জমিদার পিতা কন্যাকে মাত্র চোদ্দবছর বয়সে সশস্ত্র আন্দোলনে courier হিসাবে ব্যবহার করতেন। কল্যাণী এবং বীণা দাসের পিতা বেণীমাধব দাস কটকের র‍্যাভেনশ স্কুলের সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষক। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি কন্যা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর সমাজসেবা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থক। মীরা দাশগুপ্তের পিতা সরকারি কর্মচারী হলেও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতেন। লীলা নাগের বাবা ও ঠাকুরদা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হলেও স্বদেশিয়ানায় আগ্রহী ছিলেন। বেণু সেন বা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পরিবারের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। বিদেশি দ্রব্য পরিহারের একটা ঢেউ উঠেছিল তখন। তবে হতদরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে এটা কতটা গ্রহণযোগ্য ছিল তা আলোচনার বিষয়। এমনকি বঙ্গভঙ্গের সময় রাখিবন্ধন বা অরন্ধনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের স্বদেশচেতনা ছিল বাড়ির পুরুষদের সম্মতিসাপেক্ষ।

মেয়েদের মনে দেশাত্মবোধের যে ধারণা তৈরি হল তাতে বন্ধুত্বের বদলে মাতৃত্ব এবং নারীত্বকে উচ্চকিত করে তোলা হল। দেশ হল সম্প্রসারিত পরিবার। নারীর গৃহের কর্মকাণ্ড আরও বড় পরিসরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে তাদের উপর ন্যস্ত হল। সশস্ত্র বিপ্লবে সংগ্রামীদের আপন গৃহে লুকিয়ে রাখা, তাদের অসুস্থতায় পরিচর্যা, গোপনে রাজনৈতিক চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া, দেশরক্ষার ভাণ্ডারে স্ত্রীধন দান — এসব দায়িত্ব নারীদের উপর অনেকটাই ন্যস্ত ছিল। চন্দননগরে বিপ্লবী মতিলাল রায়ের গুদাম ঘরে শুরু হয়েছিল অরবিন্দের অজ্ঞাতবাস। মতিলাল রায়ের স্ত্রী রাধারাণী দেবী এ কথা জানতে পেরে অরবিন্দের খাওয়া থাকার গোপন ব্যবস্থা নিজেই দেখভাল করতেন। এমনকি অরবিন্দের চরম অর্থকষ্টের দিনে সাহায্য করেছেন রাধারাণী দেবী। আত্মজীবনী 'অগ্নিদিনের কথা'য় সতীশ পাকড়াশী লিখেছেন — 'মেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার কোনও পরিকল্পনা তখন ছিল না। কিন্তু মা, বৌদি, স্ত্রী ও বোন হিসাবে তাদের সাহায্য বহু ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। ফেরারি বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল, রিভলভার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা — কোন কোন বিপ্লবী পরিবারের মেয়েরা এইসব কাজ করেছেন।'

গান্ধীবাদী আন্দোলনের সূত্রে মেয়েরা সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেও সত্যাগ্রহে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অনুমতি তিনি নারীদের দেননি। নারীসুলভ আচরণ বজায় থাকতে পারে এমন ভূমিকাতে তাঁরা সীমাবদ্ধ, অহিংসা, প্রেম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তিনি নারীদের স্বাদেশিকতায় ব্রতী করতে চেয়েছেন। প্রতি ভাষণে উল্লেখিত হত মীরা অথবা সীতার কথা। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে মদ বিক্রি প্রতিরোধে মহিলাদের দায়িত্ব ছিল অনেকখানি। পরিবারেও পুরুষদের মদ্যপান থেকে নিবৃত্ত করা মেয়েদের কর্তব্য। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ও খুরশিদ বেনকে গান্ধী বলেছিলেন যে শিশুদের দেখভালের ব্যবস্থা সুরক্ষিত করে এবং অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে নারী ভলেন্টিয়ার নেওয়া কর্তব্য। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গান্ধীজি মানতেন না। ব্রিটেনের রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই — সে তো একপ্রকার নৈতিক যুদ্ধ বটে। ভারতীয় নারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নাকি বিপুল। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে গান্ধীজি একটা নৈতিক stance তৈরি করলেন। জনপদ হয়ে উঠল নৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র এবং নারীর কর্মক্ষেত্র। পারিবারিক মূল্যবোধ সঙ্গে নিয়ে নারী ঘর ছেড়ে পথে বের হল। শহরাঞ্চলে মেয়েরা পিকেটিং, বয়কট আন্দোলন এবং নানা সংগঠন করলেও গ্রামে তারা আইন অমান্য আন্দোলন এবং খাজনা বন্ধের আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে যোগ দেয়। লবণ সত্যাগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল

মেদিনীপুরের মাহিষ্য কৃষক পরিবারের মেয়েরা। পুরুষ নেতৃত্বে মেয়েরা আন্দোলনে এলেও লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক পরিস্থিতির বাইরে অন্যতম পরিচয় উঠে আসছিল। কাঁথির ঝড়েশ্বর মাঝি কিংবা মহিষবাথানের জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের নেতৃত্বে আসতেন মেয়েরা। নিম্নবর্গীয়দের মন জুড়ে ছিল ধর্মীয় চেতনা ও সংস্কার। গান্ধীবাবার কথা না শুনলে মেয়েদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব বা অন্য কোনও অভিশাপ নামতে পারে। উর্মিলা দেবী ‘বাঙ্গালার কথা’ বইটিতে লিখেছেন — ‘আজ দেশে যে একটা সাড়া পড়ে গেছে, এই যে একটা নবজাগরণের দিন এসেছে, এ সকলের সংবাদ থেকে মেয়েরা কতটা বঞ্চিত। এই যে এতকাল এদেশের নারীজাতিকে সব জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে, এতেই আজ পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি। আমি শৈশব থেকেই আমার দেশ মাকে ভালোবাসি। কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তাই মায়ের সেবার কোনো সুযোগ জীবনে পাইনি।’ যখন সেই বেদনা বুক ছাপিয়ে উঠে নিরাশার আঁধারের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল, তখন গান্ধী তাদের পথ দেখিয়েছিলেন।

ভারত মাতৃভূমি। বিদেশি শাসন, লাঞ্ছনা, অবমাননা থেকে তাঁকে রক্ষা করা দরকার। ভারতমাতা হয়ে উঠলেন মাতৃত্বের প্রতীক। মেয়েদের গৃহস্থালি আর অন্দরমহলের রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। রাজনৈতিক জগতে এসেছে গার্হস্থ্য। এমনকি যে নেহরু বিশ্বাস করতেন মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি নেই, সেই নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মনে হয়েছিল ঘর গেরস্থালি ও বাইরের রাজনৈতিক জগতকে একত্রে সামলানো কঠিন। মেয়েদের দেখাশোনার যথেষ্ট ব্যবস্থা না করে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তিনি লিখেছেন — ‘I had not allowed myself a moment to consider whether my decision to take a more active part in the struggle would be harmful to my children’s interests.... I have never quite forgiven myself for that jail term which broke my home when my children most needed its security and comfort.’ এঁদের মা স্বরূপরাণীর ক্ষেত্রে পরিবারে রাজনীতির আগমন গার্হস্থ্য ঝড়ের সমান। স্বরূপরাণীকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছিল। নেহরু পরিবারের মেয়েরা অনুভব করেছিলেন যে তাঁদের কর্মদক্ষতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের আন্দোলনে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছিল।

সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন, সময়ের ফসল। দেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল কতখানি? কোনও বিশেষ সময়ের তথ্যপঞ্জি খুঁজে পেতে ইতিহাসবিদরা তো সাহিত্যকে অন্যতম পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। দেশমাতার পূজারি বঙ্কিম তাঁর ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ বইটিতে আত্মউৎসর্গেই নারীর শেষ আশা ভরসা খুঁজেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সরোজিনী’ নাটকে ‘জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরান সঁপিবে বিধবা বালা’ দেশাত্মবোধক এই গানটি এর উদাহরণ। জাতীয়তাবাদের প্রচারের প্রাথমিক পর্বে অবসন্ন বাঙালি সতীত্ব রক্ষা কিংবা বিধবা হিসাবে আত্মাহুতি দেওয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে যাবতীয় আশা ভরসা। বঙ্কিম এর ব্যতিক্রম নন। ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী দরিদ্রদের রক্ষা করার জন্য ডাকাতি করেছে। ভবানী পাঠকের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার ইংরেজ বিরোধিতা। হিন্দু বাঙালি মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে পারে বলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ভয় পেয়েছে। তাই ত্যাগ ও পাতিব্রত্যের খাঁচা থেকে মেয়েরা বার হতে সাহস পায়নি। দেবী চৌধুরাণীও নয়। রাসসুন্দরী দাসী কিংবা সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় বিবাহিত জীবনের যে যন্ত্রণার উল্লেখ আছে তা অনুচ্চারিত অভিযোগ নয় কি? সতী প্রসঙ্গে মেয়েদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে বাঙালির স্বর অনুপস্থিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশ জননী হিসেবে পূজিত, যা হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চতুর্ভুজা ভারতমাতার ছবি এঁকেছেন। মায়ের দেহ শুদ্ধ, পবিত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের

দিনগুলিতে স্বদেশ সেবার বীজমন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম।

উনিশ বিশ শতকে রাজপুতানার ইতিহাসের উপাখ্যান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল এই ত্রয়ীর কাব্যে তার প্রমাণ। এই উপাখ্যানে বিমোহিত ছিলেন খ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যিকরা।

এই শতকের গোড়ার দিকে মেয়েদের সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক চেতনা সুস্পষ্ট প্রকাশিত। অন্ততঃ কয়েকটি পত্রিকার কথা বলা যেতে পারে। সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লীলাবতী মিত্রের কন্যা, কুমুদিনী মিত্র। তাঁর সম্পাদিত (১৯০৭-১৯১৪) 'সুপ্রভাত' পত্রিকার উদ্দেশ্য স্বদেশি আন্দোলনে সহায়তা করা এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার মাধ্যমে পাঠকদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা। স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয় প্রচার তার এক লক্ষ্য। কীসের বিজ্ঞাপন নেই — ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল (বেঙ্গল কেমিক্যাল), এসেন্স সুরমা, কেশরঞ্জন তৈল, ওরিয়েন্টাল সোপ, কমলালয় স্টোরস, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি। সরলাদেবী লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে যে বক্তৃতা দেন এ পত্রিকায় তা ছাপা হয়। আর একজন লেখিকা চপলা দেবীর মতে এদেশের সভা সমিতিতে রাজনীতি থেকে ম্যালেরিয়া পর্যন্ত সবকিছুর আলোচনা হয়ে থাকে, তার সুদীর্ঘ তালিকা দেখলে এদেশে নারী জাতির অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। অরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী' এবং কালিমোহন ঘোষের 'বয়কট উৎসব'ও এখানে প্রকাশিত হয়।

সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় 'সুপ্রভাত'। সরযূবালা বৈপ্লবিক মতবাদে বিশ্বাসী। সমাজ সংস্কার ও স্বাধীনতা আন্দোলন পত্রিকার মূল সুর। আছে রক্তদানের প্রসঙ্গ। 'উত্তপ্ত রুধির দিয়া/ভালে দিবি কে আঁকিয়া জননীরে রাজটিকা অরুণ বরণ' কিন্তু সব শেষে সেই একই কথা — সুকন্যা, সুমাতা ও সুগৃহিণীদের দেশপ্রেমের আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে। এঁদের মতে স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের শপথ নিয়ে, কাঁচের চুড়ি ভেঙে, স্বদেশি ভাণ্ডারে গহনা ও টাকা দান করে, সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়ে, স্বামী পুত্রকে বীরোচিত কাজে উদ্বুদ্ধ করে মেয়েরা দেশপ্রেমের পরিচয় দিক।

জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন লীলা নাগ। ১৯৩১ সালে ঢাকা থেকে প্রথম মুদ্রিত। ৭৪ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার দাম ছিল ছয় আনা। সচিত্র এই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে গিয়ে বারবার রাজরোষে পড়েছে জয়শ্রী। সরকারি লাঞ্ছনার ফলে জয়শ্রী বারে বারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনার প্রচার, সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের বিরোধিতা এঁদের মূল উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় লিখতেন বীণা ভৌমিক, কল্পনা দাশগুপ্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আরও ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেকে। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৭ সালে ৩০ মে সংখ্যায় লেখেন — 'জয়শ্রীর পুনরাবির্ভাবে আমি পরম সমাদরে সম্বর্ধনা করিতেছি। গত কয়েক বৎসর সমস্ত দেশের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে জয়শ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রীমণ্ডলও তাহা হইতে নিস্তার পায় নাই।' 'বেগম' (১৯৪৭-২০১০) আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক সুফিয়া কামাল। প্রথমে কলকাতা এবং ১৯৪৯-এর পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত। বাঙালি বিপ্লবী নারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশের পাশাপাশি পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তানের বাস্তুহারা নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এই পত্রিকা। ১৩৪৪ সালে গৃহলক্ষ্মী নাম পরিবর্তন করে রাখে জাগৃহি। বারো পৃষ্ঠার এই পত্রিকা ছিল সচিত্র, সাপ্তাহিক। রাজনৈতিক নানা খবরের সঙ্গে যেসব জেলবন্দি মুক্ত হতেন তাঁদের ছবি ছাপা হত এখানে। সম্পাদক তরুবালা সেন। ভগত সিংয়ের ফাঁসির দুর্লভ ছবি ছাপা হয়েছে এখানে। মন্দিরা, পরিচারিকা, বিজয়িনী এরকম এক ঝাঁক পত্রিকা সে সময় প্রকাশিত হয়েছে যা কিনা রাজনৈতিক বলা যেতে পারে। এসব পত্রিকা তৎকালীন নারীসমাজের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করতে চেষ্টা করত। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এ কথা দাবি করেছে বেগম। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বেগম পত্রিকা।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের মনকে যে কী উতলা করেছিল তার বিবরণ দেওয়ার সময়ে সাহিত্যিক লীলা মজুমদার লিখেছেন যে স্বদেশিদের আত্মোৎসর্গের কথা বলতে গিয়ে মায়ের চোখে জল গড়াত। মেয়েদের রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবনে ক্ষুদিরামের ফাঁসি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উড়িয়া সাহিত্যিক রমা দাস লিখেছেন যে ১৯০৮ সালের ১১ই অগস্ট মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময়ে তাঁর বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোপালবল্লভ দাসের উপস্থিতি তিনি কেঁদেকেটে আটকেছেন। তখন তাঁর মাত্র নয় বছর বয়স। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারাবরণ করে বাঙালি মেয়ে কীভাবে নৈতিক শুচিতা থেকে মুক্ত হল সে বৃত্তান্ত তাঁরা নিজেরাই শুনিয়েছেন। সুবর্ণপ্রভা দাস (১৮৯০-১৯৬৪) তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন রেঙ্গুনে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ ও উইলিয়াম ওয়ালেসের জীবনী। তল্লাশিতে ধরা পড়লে প্রেমানন্দের চাকরি যায়। তিনি স্ত্রীকে দায়ী করেন। মজার কথা এই যে জাতীয়তাবাদী চিকিৎসক সুন্দরীমোহন দাসের বড় ছেলে প্রেমানন্দ এবং এই পরিবারের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, উল্লাসকর দত্ত ও বারীন ঘোষের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বীণা দাস বা শান্তিসুধা ঘোষ যে সময়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন সেই সময়ে সৈয়দ আনোয়ারা মাথা খুঁড়ছেন 'অবরোধের প্রাচীরে'। কিন্তু আনোয়ারা জানতেন না হিন্দু মেয়েদের যে রাজনীতি করা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন কখনোই তার সাবলীল স্ফূরণ ঘটেনি। রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকা ছিল নিয়ন্ত্রিত, তাঁদের আত্মজীবনীগুলি তার প্রমাণ। শান্তিসুধা ঘোষ 'জীবনের রঙ্গমঞ্চে' বইটিতে লিখেছেন — 'বাড়িতে পুরুষ রাজনৈতিক কর্মী আসার অনুমতি ছিল না।' কল্পনা দত্তের (জোশী) স্মৃতিকথায় আছে — সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল না এতদিন, নেতারা তাদের বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কথায় — 'মাস্টারদার কাছে শুনি প্রীতির আত্মহত্যার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা যে মেয়েরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের জন্য তারাও লড়তে পারে।' অনেক আত্মজীবনীর কথা মনে পড়ছে। বীণা দাসের 'শৃঙ্খল' , কৃষ্ণা হাতিসিং-এর 'ছায়া মিছিল', বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের 'রুদ্ধ কারার দিনগুলি', কৃষ্ণা বসু 'চরণরেখা তব' , মণিকুন্তলা সেনের 'সেদিনের কথা', লক্ষ্মী সেহগলের 'একটি বিপ্লবী জীবন', পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' এবং আরও। সে সময় কমিউনিস্ট মেয়েরা কেউ লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেননি। এমনকি পিতৃতান্ত্রিকতার সমালোচনা করতে চাইলে গল্প উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মগোপনের অভ্যাস এখানে বহমান। বীরাঙ্গনার মতো যাঁরা দেশের জন্য লড়াই করেছেন তাঁদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত ডুবে গেছে। পৌঁছে গেছে নিটোল আখ্যানে।

এবার আসা যাক উপন্যাসের কথায়। মনে পড়ছে হরিদাস ভারতী ছদ্মনামে বিপিনচন্দ্র পালের 'শোভনা' উপন্যাস। 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী লেখনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্বর ধ্বনিত। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে তা আরও স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র নারীদরদী সাহিত্যিক। পতিতাদের নিয়ে তিনি অনেক কথা লিখেছেন কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামী নারীদের নিয়ে তার সিকিভাগও নয়। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতাহরণকারী ব্রিটিশরা কেমন করে কোন যুক্তিতে জার্মান অধিকৃত দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ে — আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা সুবর্ণলতা জানে এদেশের মেয়েরা দাসের দাস। নারীর স্বাধীনতা না থাকলে দেশের স্বাধীনতা হয় না। সুবর্ণলতার একটি স্বপ্নের বারান্দা আছে যা তার মুক্তির প্রতীক। ছেলে কানু বাড়িতে চরকা এনেছে। সুবর্ণলতার মনে হয়েছে চরকা, শোভাযাত্রা এসব

ফ্যাশনের নামান্তর। গান্ধীজীর পথে ভারত স্বাধীন হতে পারে। কিন্তু এই স্বাধীনতায় সামাজিক, রাজনৈতিক বড় কোনও পরিবর্তন অসম্ভব। কানুর চরকার মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবনা অন্দরমহলে প্রবেশ করে কিন্তু সুবর্ণলতার মতো মেয়েরা শুধু বাইরের জগতের চলমান বিরাট রথের ঘর্ঘরধ্বনি শুনতে পায়। সংসার আর সন্তান উৎপাদনে তাদের জীবন সীমায়িত। বিদ্রূপ, উপহাস, বিরূপতা তার নিত্যসঙ্গী। গৃহে বিদেশি কাপড়ে আগুন ধরালে দেওর প্রভাস বলে 'আমরা কি বাড়িতে রাজনীতি চর্চা করব?' তারপর সে তার বউদিকে বলে এ পাগল হয়ে গেছে। চিকিৎসা দরকার। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেখিয়েছেন মেয়েদের কেমন করে মৌলিক অধিকারগুলো আপোষ করে চলতে হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'বকুল কথা'তেও সেই একই ভাবনা প্রতিফলিত।

স্বল্প পরিসরে সব উপন্যাসের আলোচনা সম্ভব না হলেও আর একখানি উপন্যাসের কথা মনে পড়ে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। এই উপন্যাসে তিনি বেছে নিয়েছেন মহাকাব্যের উপেক্ষিত স্ত্রীপর্বকে। ৪৬-এর দাঙ্গা এবং স্বাধীনতার পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসের প্রাথমিক নাম তিনি দিয়েছিলেন 'স্ত্রীপর্ব'। এই উপন্যাসে সুতারা স্বয়ং প্রচ্ছন্ন স্বদেশ। তাকে মানুষ নিজের স্বার্থে লাঞ্ছিত, আশ্রয়হীন কিংবা দ্বিখণ্ডিত করে। সে সীতা, দ্রৌপদী, অম্বা, লুণ্ঠিতা দ্বারকারমণী, কিংবা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত সৈনিকের স্ত্রী বা কন্যা। লেখিকা বলেছেন এই উপন্যাসে রামায়ণ মহাভারতের সময় থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত পুরুষশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীরে সমাহিত থেকেছে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাজাত এক একটি স্ত্রীপর্ব। মনে পড়ে যায় সাবিত্রী রায়ের 'ত্রিস্রোতা', 'স্বরলিপি' (নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল), 'পাকা ধানের গান', সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর'-এর কথা। 'ত্রিস্রোতা' উপন্যাসে জটিল রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। ঠাকুরদা গান্ধীবাদী, কাকা সশস্ত্র বিপ্লবী, স্বামী কমিউনিস্ট, মত ও পথের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত মুখ্যচরিত্র পদ্মা।

'পাকা ধানের গান' উপন্যাসের ভূমিকায় তনিকা সরকার বলেছেন সাবিত্রী রায়ের রাজনৈতিক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসেও নারীর স্বাধীনতার অর্থ তথাকথিত সমাজঘোষিত নারীত্ব থেকে মুক্তি। গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ড অক্ষুণ্ণ রেখে নারীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগোতে হবে এটাই প্রধান শর্ত। মেয়েদের স্ত্রী ও মা হিসেবে ভূমিকাটি দেশমুক্তির কাজে ব্যবহৃত। এই তথাকথিত female identity সুলেখা সান্যাল বা আশাপূর্ণার উপন্যাসে নায়িকাদের ironical মনে হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ডায়রিতে বিলুর মা একটি মুখ্য চরিত্র। জেলবন্দি এই মহিলার আর কোনও পরিচয় জুটল না। বাংলা উপন্যাসে এমনকি ছোটগল্পেও স্বাধীনতা যোদ্ধা নারীর উপস্থিতি নগণ্য। গল্পগুচ্ছে ডিটেকটিভ গল্পে পুলিশের স্ত্রী হয়েও বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল নায়িকা। তবে অবনমিত হিসাবে উপস্থিত অনেক চরিত্র। নরেশচন্দ্র গুপ্তের 'শাস্তি' উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনকারী গোপা ও কমল জেল থেকে পালিয়ে স্বামী স্ত্রী হিসেবে বাস করে। গোপাকে কমল মা বলে সম্বোধন করে। তারপর দৈহিক সম্পর্ক। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মেয়েদের রাজনীতি করার কথা থাকলেও তা মূল বক্তব্য নয়। 'চিহ্ন' উপন্যাসে সীতা রাজনীতি করে। তবে কাহিনি সরে গেছে অন্য মাত্রায়। 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসেও তাই।

পৃথিবীর অনেক দেশেই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় জাতির ইমেজ বা সংস্কৃতির সঙ্গে মাতৃশক্তি সম্পৃক্ত। ঋষি অরবিন্দ একটি চিঠিতে তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন তিনি দেশকে মা বলে পূজা করে ভক্তি ও নৈবেদ্য সমর্পণ করেন। যদি কোনও রাক্ষস মায়ের বক্ষের উপর বসে রক্ত পান করে, তাহলে সন্তান কী করতে পারে? বাংলা নাটকেও দেশ মাতৃকার কথা বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। ১৮৭৩ ও ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে হরলাল রায়ের 'হেমলতা' ও 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটক। তাছাড়া কিরণচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন'। এরই একটা অংশ হিন্দুমেলায় 'ভারতমাতার বিলাপ' নামে অভিনীত হয়। এই ধরনের সব নাটকেই দেশমাতাকে কেন্দ্র করে সন্তানের দুঃখ, আর্তি, বিলাপ ধ্বনিত। রানি ভিক্টোরিয়া দরদী সম্রাজ্ঞী। স্বদেশিয়ানার প্রথম পর্বে তা মনে হয়েছিল বাঙালির। দেশজননীর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারে পরিপূর্ণ হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটার। নীলদর্পণ নাটকে ক্ষেত্রমণির উপর ইংরেজ সাহেব অত্যাচার করলে 'আয় সুমুন্দির পো' বলে হাঁসুয়া হাতে তোরাপ লাফিয়ে পড়ে। তোরাপের এই হুঙ্কার যেন নিপীড়িত ভারতবাসীর সব ক্ষোভের প্রতীক। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নায়িকা কৃষ্ণা দেশরক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরবিক্রম' নাটকে রানি ঐলবিলার স্বদেশ প্রেম ও বীর্যবত্তার কথা আছে। 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকের বিষয় বাংলার ইতিহাস। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সেনাপতি বিরাট সেন বক্তিয়ার খিলজির প্রস্তাবে বলে 'আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে মা বলবো? আমি বঙ্গমাতার সন্তান। এ আমার পরম গৌরব।' উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটককে অশ্লীল বলে ঘোষণা করার অন্যতম কারণ বিরাজমোহিনীর উপর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র মৃন্ময়ী দেশমাতাকে চিন্ময়ী রূপে কল্পনা করে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন — 'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপী অনন্ত রত্নভূষিতা — এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।' যন্ত্রণা বহন করার অপরিসীম ধৈর্য হিন্দু নারীর ঐশ্বর্য। আর তাই বাংলা কাব্যে ও নাটকে পদ্মিনী উপাখ্যান অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। জাতীয়তাবাদের প্রচলনের গোড়ার দিকে অবসন্ন বাঙালী এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল যাবতীয় আশাভরসা। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

খ্রিস্টানদের দ্বারা হিন্দুর শুচিতা আবার বিঘ্নিত হচ্ছিল। তাই হিন্দু পুরুষের জাতীয়তা এবং আত্মাভিমানের বিষয় হল বিধবার শুচিতা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা। তবে এর উল্টোটাও ঘটেছে, যাঁরা বিধবা বিবাহ বিরোধী তাঁরাও বিবাহ আসরের আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির হয়েছেন সেখানে।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পরে বছর কুড়ি প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। ধর্মীয় পুনর্জাগরণ যা স্বজাত্যবোধের অন্তর্গত, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তা দেখা দিল। এমনকি ন্যাশনাল থিয়েটার হলে মহিলাদের সিট বাড়িয়ে দিলেন তিনি। গিরিশচন্দ্রের নাটকে একান্নবর্তী পরিবারের সাহায্য, দেশাত্মবোধ, বিধবা নারীর ত্যাগমহিমা আর ব্রহ্মচর্য, এমনকি রানি ভিক্টোরিয়ার উপর আস্থা ঘোষিত হয়েছে। জাতীয়তার গৌরবের সঙ্গে নারীর দেহমনকে গিরিশ-সমকালীন এমনকি তাঁর পরবর্তী নাটকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে, স্ত্রী শিক্ষা নিয়েও ঘোরতর বিতর্ক। অমৃতলাল বসুর নাটকে স্ত্রীস্বাধীনতা এবং জাতীয়তা বিসর্জনের বিরুদ্ধে শ্লেষ ধ্বনিত হয়েছে। এটাও জাতীয়তাবাদের আর এক দিক। সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখেছে — 'রাখি পরানোর সময়ে লিঙ্গভিত্তিক দূরত্ব রাখা দরকার।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকেও নারী চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বদেশাত্মক বাণী বহন করেছে। তাঁর লেখা 'প্রতাপ সিংহ' দেশাত্মবোধক নাটক। 'মেবার পতন' কিংবা 'দুর্গাদাস'ও তাই। 'তারাবাঈ' নাটকে অনৈতিহাসিক চরিত্র তারা নাটোরের রানী ভবানীর কন্যা। সে ন্যায়শক্তি, ধর্মশক্তি ও দেশশক্তির প্রতীক।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে। ঘরের কাজকর্ম করে চরকা কাটতেন গৃহবধূ। তাছাড়া বিপ্লবী দলের ছেলেদের আশ্রয় দেওয়া, গুপ্ত নথি, চিঠিপত্র পৌঁছে দেওয়া, অস্ত্র সরবরাহ এসব কাজে এগিয়ে এসেছিলেন মেয়েরা। নিবেদিতার আত্মত্যাগ, সরলা দেবী চৌধুরাণীর সংগ্রামী চিন্তা বাংলা নাটককেও প্রভাবিত করেছিল। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দশ বৎসর বাঁধ ভাঙল। মাটির সংগ্রাম, মেয়েদের লড়াই শেষ দশ বৎসর সরাসরি চলে এল নাটকে। মহেন্দ্র গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। একে একে যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, আজাদ হিন্দ ফৌজ এর পতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাংলায় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এল। শচীন

সেনগুপ্তর অনেক নাটকেই বলা হয়েছে যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রীতি ব্যাহত বলে ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রীতি সম্পূর্ণতা পায় না।

বাংলা নাটকের স্বদেশ ভাবনায় মেয়েদের উত্থান কোনও সরলরৈখিক পথ ধরে চলেনি। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্তৃত পর্ব নারীর উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মঞ্চে নারীর দেশাত্মবোধের অভিনয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে দর্শক, মূলতঃ মহিলা দর্শকের উপর। দেশ ভাবনার ঢেউ ছুঁয়ে গেছে, প্রাণিত করেছে বহু নারীর মন।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় যেসব মহিলা কবি তাঁদের কবিতা ও গানের ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পেও পাওয়া গেছে এই আন্দোলনের কথা। এর মধ্যে যশোমালিনী দেবীর 'পূজার চিঠি', আশালতা সেনের 'পরাজয়', সুরবালা দাসীর 'ব্রত ধারণ' — এসবের কথা মনে পড়ে যায়। তবে এ কথা ঠিক, গল্প উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রামী নারীরা তেমনভাবে প্রতিফলিত হননি। দেশের কাজে ছোটবড় নানা কাজে তাঁরা অগ্রণী হয়েছেন, শাসকের হাতে অত্যাচারিতা বা ধর্ষিতা হয়েছেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এমন উৎসর্গীকৃত প্রাণ মানবীরা সর্বত্র যোগ্য সম্মান পাননি। পরিবারে, গৃহে, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত থেকেছেন, এই উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছে সাহিত্যের অনেক প্রান্তে। রবীন্দ্রনাথ পুরুষদের পাশে মহিলাদের স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করেছিলেন, বঙ্গভঙ্গের দিন ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন, কলকাতায় হরতাল পালিত হল। মুর্শিদাবাদের জেমো-কান্দি গ্রামের পাঁচ শতাধিক মহিলা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মা চন্দ্রকামিনী দেবীর আহ্বানে তাঁদের বাড়ির বিষ্ণুমন্দিরের উঠোনে সমবেত হন ও অরন্ধন ব্রত পালন করেন। সেখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের সদ্য লেখা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পড়ে শোনান রামেন্দ্রসুন্দরের ছোট মেয়ে গিরিজাদেবী। এই প্রবন্ধে মহিলাদের স্বদেশি আন্দোলনের অংশীদার করা হয়েছে এবং কাঞ্চন ফেলে কাচ আঁচলে না বাঁধবার সংকল্প করানো হয়েছে।

দেশমাতৃকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই ছিল আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সহিংস বিপ্লব হোক কিংবা অহিংস আন্দোলন, শত সহস্র নারী যোগ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনয়নকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করেছেন, কালের গর্ভে অনেকেই অতলে তলিয়ে গেছেন, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন স্বল্প যা কোনোমতেই হওয়া উচিত ছিল না।

তথ্যসূত্র :

১) Identities and Histories / Women's writing and Politics in Bengal / Sarmistha Dutta Gupta / Stree / 2010

২) Women in the Indian National Movement / Suruchi Thapar / Bjorkert Sage Publications / 2006

৩) The Goddess and the Nation / Mapping Mother India / Sumathy Ramaswami / Duke University Press 2010

৪) নারীবিশ্ব / সম্পাদনা পুলক চন্দ / গাঙচিল /২০০৮

৫) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস / ক্ষেত্র গুপ্ত / গ্রন্থ নিলয় /২০০৬

৬) স্বদেশ ভাবনায় বাংলা নাটকে মেয়েরা / শম্পা ভট্টাচার্য। / গ্রন্থ - স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলা থিয়েটার / সম্পাদক ব্রাত্য বসু পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি / ২০২২

শম্পা ভট্টাচার্য : প্রাবন্ধিক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ।